বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

নীরদবরণ মণ্ডল

এত অল্প বিদ্যা নিয়ে ও সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিরোনাম সূচিত এমন ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়াটা দুঃসাহসের পরিচায়ক। তাই মনে বেশ সংকোচ অনুভব করছি। বিশেষত যেক্ষেত্রে বাংলা ভাষাতেও (ইংরাজিতে তো আছেই) সাম্প্রতিক কালে পাণ্ডুলিপি-বিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু ভালো গ্রন্থ লেখা হয়েছে—প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রথমেই ঈশ্বর-স্মরণ করতেই শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের একটি পদ্য মনে পড়ল—মালিনী ছন্দে লেখা। যথা :

অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরু বরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।

অর্থাৎ যদি কালো পর্বতের মতো কজ্জল বা কালি হত, যদি সিন্ধু রূপ পাত্র থাকত, বা সাগর যদি দোয়াত হত, সুরতরুবরের শাখা যদি লেখনী হত, আর সারা পৃথিবীটা যদি পত্র হত, যদি স্বয়ং সরস্বতী সর্বকাল ধরে লিখে যান, তবুও হে ঈশ্বর তোমার গুণাবলীর পার পান না।

কোনো কিছু লেখার ক্ষেত্রে সে আমলে কী কী বস্তু প্রয়োজন হত তার একটা বিবরণ আমরা এর মধ্যে প্রকারান্তরে পেয়ে যাচ্ছি। এটি গন্ধর্ব পুষ্পদন্তের রচিত বলে প্রসিদ্ধ। খুব সম্ভবত এটি খ্রিস্টীয় দশম শতকেরও আগেকার রচনা। অর্থাৎ বেশ পুরোনো আমলের। সেই সময়ে লেখার উপকরণ হিসেবে যা প্রয়োজন হত তা বোঝা যাচ্ছে। একটি লেখনী এবং কালি (এবং অবশ্যই লেখকের সারস্বত-কর্মোপযোগী মন)। কালি, কলম ও মন ছাড়া আর একটি জিনিস দরকার—তা হচ্ছে পত্র। অর্থাৎ প্রয়োজনীয়

বস্তুগুলি হচ্ছে লেখনী (বা শব্দান্তরে কলম), কজ্জল (বা কালি—কালো রং তাই কালি) আর কালি গুলে রাখার জন্য চাই পাত্র—যাকে আমাদের ছেলেবেলায় বলা হত দোয়াত। আর পত্রকে যে এখনও পত্র বলেই প্রকাশ করা যেতে পারে সে কথায় পরে আসছি। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে সংস্কৃতের অনেক লেখকের মতো পুষ্পদন্তের কাল নিয়েও মতভেদ থাকতে পারে।

যাই হোক, মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে পাতনিকা বা গোড়ার কথা হিসাবে কিছু কথা প্রবন্ধ সৌকর্যের জন্য বলা প্রয়োজন—যাতে বিষয়টি উপস্থাপনের সুবিধা হয়। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীভূত বিষয় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি হচ্ছে বস্তুত হাতে লেখা গ্রন্থ। ইংরাজিতে বলা যায় Manuscript। এ কথা সুবিদিত যে Manuscript শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে এসেছে। অর্থাৎ Manu(=by hand-abrlative of Manus)+Scriptus (=written=past participle of Scibere=to write)। এইভাবে বোঝা যায় Manuscript হচ্ছে যা হস্তলিখিত বা হাতে লেখা। সুতরাং Manuscript শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হস্তলিপি হওয়াই ভালো ছিল, কিন্তু বাংলায় বলা হয় পাণ্ডুলিপি। কেন বলা হয়? তার কারণ এই লেখাগুলি যে ধরনের পত্রে বা তুলট কাগজে লেখা হত তা পাণ্ডুবর্ণ বা ধূসর বর্ণ ধারণ করত। তাই এগুলির নাম পাণ্ডুলিপি (হরিদ্রাভ ধূসর বলা যায়)। তবে কাগজে সন্নিবেশিত হাতে-লেখা যে-কোনো ভাষানিবদ্ধ রচনাকে ব্যাপক অর্থে Manuscript (বা পাণ্ডুলিপি) বলা গেলেও আমাদের মনে হয় সেগুলি পাণ্ডুলিপি বিদ্যার প্রধান বা মূল উদ্দিষ্ট নয় (যেমন প্রেসে পাঠাবার জন্য লেখকেরা যে ছাপানোর উদ্দেশ্যে Manuscript তৈরি করেন বর্তমান কালে)। এগুলিকে আপাতত পুঁথিবিদ্যার বিষয় না করাই অভিপ্রেত। কাজেই বলা যায় পুরোনো আমলের সংস্কৃতির নানা পরিচয়বাহী হাতে-লেখা গ্রন্থই পুঁথি—সেই পুরাতন লেখাগুলিই পুঁথি বিদ্যার মূল উদ্দিষ্ট। পুঁথির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই মনে রাখা উচিত। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে যে প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী (বা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে) শিলালিপি প্রভৃতি হাতে তৈরি হলেও Manuscript বা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত নয়। এই পার্থক্য কিন্তু একান্ত ভাবে ব্যবহারসিদ্ধ। অবশ্য লিপিবিদ্যায় সাহায্যলাভের জন্য (অর্থাৎ বিভিন্ন কালপর্যায়ে কোনো লিপিবিশেষের আকারগত বিবর্তনের জ্ঞানলাভে সাহায্যের জন্য) শিলালিপি প্রভৃতির পাঠ প্রয়োজনীয় হতেও পারে। কারণ স্থায়ী ও তৎকালীন অবস্থার (লিপিগত রূপটির) যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান রূপে শিলালিপি একদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাতে-লেখা পুঁথি হয়তো নকলের নকল বা তারও পরম্পরাপ্রাপ্ত রূপ। সেখানে ইতিহাস-উদাসীন লিপিকার বা ব্যাখ্যাতার স্বকৃত প্রক্ষেপ থাকতেও

পারে। লিপিকারের লিপিতে তার সমকালীন লিখনশৈলী অনুসৃত হতে পারে। কিন্তু শিলালিপি অত্যন্ত স্থায়ী বলে এর মধ্যে প্রক্ষেপ বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং লিপিবিবর্তনের ইতিহাসে শিলালিপির জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হতে পারে (ব্রাহ্মী লিপির রূপটি যেমন আমরা সাধারণত শিলালিপি, বা তার ফোটোকপি থেকেই বোঝার চেষ্টা করি)।

সে যাই হোক—প্রবন্ধের বিষয়টিকে যে অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে—তার কারণটিও সহজবোধ্য। তার কারণ এই যে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সব ভাষাতেই পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিই ছিল বই-এর একমাত্র বিকল্প (অবশ্য মুদ্রণযন্ত্র প্রচলিত হওয়ার পরেও যে অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে—সে কথায় পরে আসছি)। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা আছে—এবং তদনুরূপ অজস্র লিপিও আছে। শুধু ভারতেই যে সব লিপির সন্ধান পাওয়া যায় তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রতিটি লিপির আবার নিজস্ব বিবর্তনের ইতিহাস থাকা সম্ভব। সুতরাং লিপিবিদ্যার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিশাল ও ব্যাপক। প্রবন্ধকারেরা, গবেষকেরা এই সব কথা বোঝেন—সেইজন্য সাধারণত একটি বা নির্বাচিত কয়েকটি ভাষা ও লিপির ক্ষেত্রটিকেই (যেগুলি একই আলোচনাসূত্রে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় হওয়াটাও সম্ভবপর) স্বীয় পর্যালোচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকেন। বাংলা ভাষায় নিবন্ধ পুঁথিগুলি অবলম্বন করে এরূপ বেশ কিছু ভালো গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোথাও কোথাও বাংলা লিপির বিবর্তনের রূপটিও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বাংলা পুঁথি যে সবসময় বাংলা লিপিতেই করা হয়েছে—এ কথা বলা যায় না। গবেষকেরা জানাচ্ছেন যে বাংলা পুঁথি বাংলা লিপি ছাড়া অন্তত সাতটি বিভিন্ন লিপিতে পাওয়া যায় (দ্র. বাংলাপুঁথির নানা কথা—অচিন্ত্য বিশ্বাস, ৭৭পৃ.)। সেগুলি হল (১) আরবি (২) ওড়িয়া (৩) কৈথী বা কায়থী (৪) দেবনাগরী (৫) নেওয়ারী (৬) রোমান (৭) সিলেটী নাগরী (ড. যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্যের গণনা-অনুযায়ী)। প্রত্যাশিত ভাবেই আরবি লিপিতে বাংলা পুথিগুলি ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের লেখা। খ্যাতনামা বিদ্বান আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এই ধরনের পঞ্চাশটি পুথি সংগ্রহ করেন (ড. সুবীর মণ্ডল তাঁর 'বাংলালিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থে ৫৭ পৃষ্ঠায় আরবি-ফারসি-অক্ষরে বাংলা লেখার উদাহরণ দিয়েছেন। খন্দকার মুজাম্মিল হক্-এর গ্রন্থ থেকে)। আর রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা বই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে—সেটি অবশ্য পুঁথি নয় (এইখানে জানিয়ে রাখি পুঁথি শব্দের বানানে কেউ কেউ চন্দ্রবিন্দু দেননি। যেমন শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য বিশ্বাস ও ড. কল্যাণ কিশোর চট্টোপাধ্যায়)। অনুরূপভাবে সংস্কৃত পুঁথিও

বিভিন্ন লিপিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যকৃতিগুলি (বাংলা পুঁথির ক্ষেত্রে) বাংলা অক্ষরেই পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে এভাবে বলা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে চর্চা করা হয়। বাঙালিরা বাংলা হরফেই অজস্র সংস্কৃত পুঁথি লিখেছেন (একটা প্রমাণস্বরূপ বিশ্বভারতী কর্তৃক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত 'Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts' দেখুন)। অন্যান্য প্রদেশেও সংস্কৃত পুঁথি স্থানীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক লিপিতে লেখা হয়েছে। যেমন—ওড়িয়া। আবার শারদা লিপিতে সংস্কৃত ও কাশ্মীরি এই দুই ভাষারই পুঁথি আছে। শারদা লিপির ব্যবহার খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই—অর্থাৎ বেশ প্রাচীন। মৈথিল এবং মালয়লম লিপিতে সংস্কৃত পুঁথি উপলব্ধ হয়। মৈথিলী এবং মালয়ালম ভাষার নাম হলেও শারদা ও গ্রন্থ—এই দুটি শব্দ শুধু লিপির নাম। অর্থাৎ শারদা ও গ্রন্থ নামে কোনো ভাষা নেই। দেবীপুরাণের মতে 'নন্দিনাগরকৈ র্বর্ণে র্লেখয়েচ্ছিব পুস্তকম্।' (৫০৫ পৃ.)। অর্থাৎ মাঙ্গলিক গ্রন্থ সকল নন্দিনাগর অক্ষরে লেখাতে হবে। শ্রদ্ধেয়া রত্না বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন—'তামিল লিপিতে কোনো সংস্কৃত পুঁথি নেই।' (দ্র. 'Aspects of Manuscriptology'-P.21) সংস্কৃত পুঁথিতে গ্রন্থলিপির ব্যবহারও আছে (বর্তমানে সংস্কৃত গ্রন্থ দক্ষিণভারতে এই লিপিতেও ছাপানো হয়েছে)। এইজন্য সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে হলে বিভিন লিপির অনুশীলন করাও প্রয়োজন। বিশেষত একই গ্রন্থের বিভিন্ন লিপিধৃত বিভিন্ন পুঁথির তুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বারা প্রকৃতপাঠ নির্ণয়ের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়—বিভিন্ন লিপির বিভিন্ন কালপর্যায়ে তৎকালীন বিবর্তিত রূপটি সম্বন্ধেও সচেতন থাকা প্রয়োজন। কেননা গবেষণার বিষয়ীভূত পুঁথিটি ঐতিহাসিকভাবে কোনো এক বিশেষ কালপর্যায়ের অন্তর্গত হতে পারে। এ সব গবেষণা ও আলোচনা তাই স্বভাবতই এক বিপুল শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সেইজন্য প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি বিষয়টিকে অত্যন্ত ব্যাপক বলে উল্লেখ করেছি (নন্দিনাগরক ও একপ্রকার লিপির নাম।) তবে আলোচনার সুবিধার্থে সীমিত পরিসরে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু বাংলা ও সংস্কৃতের কয়েকটি গ্রন্থকেই অবলম্বন করা হবে এবং বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করা হবে। তার আগে লিপিবিদ্যা ও পুঁথির ইতিহাসে আর-একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক।

ভারতীয়দের নিজস্ব লিপির উদ্ভব ও ব্যবহার কখন থেকে শুরু হল এই বিষয়টি অত্যন্ত বিতর্কিত। এ কথা সুবিদিত যে বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিত বিস্তর'-এ উপলব্ধ চৌষট্টি প্রকার লিপির তালিকায় প্রথমে উক্ত নাম ব্রাহ্মী—তদনুসারে এবং কিছু জৈনগ্রন্থাদির

উক্তিপ্রামাণ্যে সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে প্রাপ্ত বিশেষ একপ্রকার লিপিকে বলা হয় ব্রাহ্মী লিপি এবং নানা পর্যবেক্ষণে সিদ্ধান্ত করা হয় যে পরবর্তীকালের অধিকাংশ ভারতীয় লিপিগুলি তারই বিবর্তিত রূপ। এক্ষেত্রে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মনে করেন বৈদিক যুগের ভারতীয়রা লিখতে জানতেন না (অর্থাৎ তাদের নিজস্ব লিপিজ্ঞানও ছিল না)। (এ বিষয়ে দ্র. 'The Origin of Brahmi script. বই-এ S.R. Goyal রচিত 'Brahmi An invention of the early Mauryan period নামক প্রবন্ধ) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ বলেন মেগাস্থিনিস্, যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রিকদূত ছিলেন, জানিয়েছেন—(তাঁর দেখা) ভারতীয়দের লিখিত বর্ণবিষয়ক জ্ঞান বা লিপিজ্ঞান ছিল না, তাঁরা স্মৃতি থেকে সব কিছু নির্ধারণ করেন। মেগাস্থিনিস্ অবশ্য আরও অনেক আশ্চর্য কথা বলেছেন। এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের অবকাশ এখানে নেই। এইটুকু বলা যায় যে পাণিনি তাঁর সূত্রে 'গ্রন্থ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন এবং 'যবনানী সিদ্ধ করেছেন—কাত্যায়নের মতে তার অর্থ—যবনদের লিপি। নিজেদের লিপি থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যেই হয়তো যবনানী শব্দটি প্রয়োজনীয় হয়েছিল (দ্র. পাণিনি ৪/১/৪৯)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বৃত্ত চৌলকর্মা রাজা বা রাজপুত্রের লিপি ও সংখ্যা শিক্ষা করার কথা আছে। কিছুটা পরবর্তীকালে বাণভট্টের হর্ষচরিতে (পুস্তকবাচকঃ সুদৃষ্টিঃ লেখকো গোবিন্দকঃ পুস্তকৃৎ কুমার দত্তঃ) এবং কাদম্বরীতে (...কুহক তন্ত্রমন্ত্র পুস্তিকা) পুস্তক শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। বাণভট্টের আবির্ভাবকাল বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি নির্বিবাদ—কারণ তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। (হর্ষবর্ধনের কাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বাণভট্টের পূর্বে কালিদাস আবির্ভূত—এবং তারও পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছে। রামায়ণে সুন্দর কাণ্ডে আছে হনুমান্ নিজের পরিচয় প্রমাণিত করার জন্য সীতাকে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়েছেন (বলেছেন 'রামনামাঙ্কিত পেদং পশ্য দেব্যঙ্গু রীয়কম্')। লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থবিশিষ্ট বহু শব্দ বৌদ্ধ পালি সাহিত্যেও পাওয়া যায়। যেমন বিনয়পিটকে লেখা, লেখক, অক্খরিক (=অক্ষরক্রীড়া), লিখিতক চোর (=recorded thief)। নিকায় ও জাতকে লেখনী, লেখসিপ্প (=লেখশিল্প), পোত্থক (=পুস্তক), পণ্ণ (=চিঠিপত্র), অক্খরানি (=বর্ণমালা), ইনপন্ন (=দলিল) প্রভৃতি। এগুলি নিঃসন্দেহে লিপি ও পুস্তকের অস্তিত্ব সূচিত করে (দ্র. 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী')। সম্রাট অশোকের পূর্বকালেরও রচিত (অতিসামান্য হলেও) কিছু ব্রাহ্মী লিপির সন্ধান ঐতিহাসিকেরা পেয়েছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে অশোকের শিলালিপিগুলিই প্রমাণ করছে যে খ্রিস্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই ভারতীয়দের নিজস্ব লিপিজ্ঞান

ছিল। এবং তাঁরা মনে হয় লেখার জন্য গাছের পত্র ও ছাল ব্যবহার করতেন। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি পদ্যবন্ধ মনে পড়ে। যথা—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দু শোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর সুন্দরীণা মনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্।।

অর্থাৎ যেখানে (যে হিমালয়ে) ধাতুরসের সাহায্যে অক্ষরগুলি বিন্যস্ত করায় (একটি বিশেষ বয়সে) হাতির চামড়ার বিন্দুজালকের মতো লাল-লাল-দাগ বিশিষ্ট ভূর্জ গাছের ছালগুলি বিদ্যাধরসুন্দরীদের প্রেমপত্রের কাজে লাগত। টীকাকার মল্লিনাথের মতে 'ধাতুরসেন' কথাটির অর্থ হল 'সিন্দূরাদিদ্রবেণ'। তাই লেখা হয়ে যাবার পর ভূর্জত্বকের লিখিতভাগটি একটি বিশেষ বয়সের হাতির চামড়ার মতো লাল লাল বিন্দু বা দাগে পূর্ণ দেখাত। মল্লিনাথ বলেছেন 'লিখিতভাগোদ্বিতি শেষঃ'। হাতির গায়ে ঐ বিন্দু বিন্দু দাগগুলিকে পদ্মক বলা হয়। অপর টীকাকার চারিত্র বর্ধনের মতে 'ধাতুরসেন' কথাটির অর্থ হল —'হরিতালাদীনাং রসেন দ্রবেণ'। যাই হোক, লেখার আধার হিসাবে ভূর্জত্বক যে গ্রহণ করা যেতে পারে এইরূপ ধারণা মনে হয় কালিদাসের ছিল এবং ভূর্জত্বকের এই প্রকার ব্যবহার তখন প্রচলিত থাকাটা আশ্চর্য নয়। তাই তো বিদ্যাধর সুন্দরীরা ভূর্জত্বকের উপরেই প্রেমপত্রের কাজ করতেন। এই ভূর্জত্বক হচ্ছে টীকাকার মতে ভূর্জপত্র বল্কল। পরবর্তীকালেও ভূর্জত্বকে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন কালে লেখার আধার হিসেবে গাছের ছাল ব্যবহৃত হত। পাশ্চাত্যে প্রাচীন কাল্‌দীয়েরা গাছের ভিতরের ছালকে বলত leber (দ্র. 'গ্রন্থবিদ্যা' আদিত্য ওহদেদার, পৃ. ৯)। এই leber শব্দই পরে libre হয়ে বই অর্থে ব্যবহৃত হয় (ফরাসি ভাষায় স্মরণীয়)। লিখন কার্যে গাছের ভিতরের ছাল ব্যবহৃত হয় বলেই বইকে বলা হয় libre। (ইংরাজি অভিধানে অবশ্য leber শব্দটি অন্য অর্থে আছে একজন ডাক্তারের নাম হিসাবে যেমন I Leber's atrophy এক প্রকার চক্ষুরোগ তবে liber শব্দটি গাছের ভিতরকার ছাল বা imer bark অর্থে আছে)। মনে হয় প্রাচীন কাল্‌দীয়দের ব্যবহৃত উক্ত শব্দ থেকেই ফরাসি livre এবং ইংরাজি library ও librarian শব্দগুলি ব্যুৎপন্ন। Libre-ই উচ্চারণভেদে livre। লাতিনেও librāria, librārius শব্দগুলি পাওয়া যায়। 'The Random House Dictionary of the English Language'-এ liber শব্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে liber=n. Bot.phloem. [< £: bark]. (আরও দ্র. 'The concise oxford dictionary of English etymology')। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে গাছের ছালের উপর লেখার প্রথা প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যদেশেও ছিল। ইংলন্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিতে মেক্সিকো-দেশীয় সাংকেতিক অক্ষরে গাছের

ছালের উপরে লেখা বই-এর নিদর্শন সংরক্ষিত আছে (দ্র. 'গ্রন্থবিদ্যা' পৃ. ৯)। ভূর্জত্বকের উপরে লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি বর্তমান প্রবন্ধকারের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে শোনা যায় যে পাকিস্তানের গিল্‌গিটে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি গুপ্ত ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা ও অধিকাংশত ভূর্জপত্রে লেখা এবং সংরক্ষিত আছে নূতন দিল্লির জাতীয় অভিলেখাগারে। এগুলিই ভারতে প্রাচীনতম পুঁথি সংগ্রহ (দ্র. 'Aspects of Manuscriptology'. The Asiatic Society. Kolkata. শ্রদ্ধেয়া রত্না বসুর প্রবন্ধ)।

লিখনকর্মের ব্যাপারে বৃক্ষের একটি বিশেষ অবদান ছিল। লেখকদের স্মৃতিতে বৃক্ষের কথা যেন অনিবার্য ছিল। গ্রন্থের ক্ষেত্রেও দেখি বৃক্ষ-সম্পর্কিত নানা শব্দ উপযুক্ত তাৎপর্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন কোনো কোনো গ্রন্থের বিভাগগুলিকে কাণ্ড, পর্ব, বল্লী প্রভৃতি নামে প্রকাশ করা হচ্ছে। বেদের বিভিন্ন পাঠবিশেষের ধারাকে শাখা বলা হয়, তাও তো বৃক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। আবার পুঁথির পাতাকেও সঙ্গত কারণেই পত্র বলা হয়। বস্তুত তালপাতা, তেরেট পাতা প্রভৃতি নির্মিত পুঁথির পাতা তো বৃক্ষের পত্রবিশেষই। বৃক্ষের পত্রের মতো পুঁথির পত্রও একই ভাবে উল্লিখিত হয়। সেগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হয়েই তো গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। পত্র কথাটার অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে অন্য কিছু কাগজপত্র বোঝাতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বৈদিক যুগে লিখনপ্রণালী ও গ্রন্থ না থাকলে ঐ সমস্ত শব্দের ব্যবহার কখন থেকে কীভাবে প্রচলিত হল? অশোকের ব্রাহ্মী শিলালিপির যে লিপিপ্রণালী তা কি একটা তৎকালীন আকস্মিক আবির্ভাব, অথবা বৈদিক যুগেও তার কোনোপ্রকার পূর্বরূপ প্রচলিত ছিল বা বিকশিত হচ্ছিল—এই সব প্রশ্ন আমাদের মনকে আন্দোলিত করে। পুস্তকনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বনাধ্যক্ষকে তালি, তাল ও ভূর্জবৃক্ষ রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শাস্ত্রে নিবন্ধপুস্তক শব্দটিও আছে।

যদিও আমরা সুদূর অতীত কালের লিপিবিদ্যার ইতিহাস দিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, বস্তুত পক্ষে কোনো উপলভ্যমান পুঁথির বয়স এত বেশি নয়। সুদূর প্রাচীন কালের পুঁথি কালপ্রবাহে নষ্ট হয়ে গেছে। বাংলা পুঁথির ক্ষেত্রে বলা যায় চর্যাপদের পুঁথিটিই উপলভ্যমান বাংলা পুঁথির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং এর পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) পুঁথিটিও প্রাচীন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় পুঁথি দুটি যথাক্রমে আনুমানিক চতুর্দশ ও ষোড়শ শতকে লিখিত (দ্র. 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। এ বিষয়ে তুষারকান্তি মহাপাত্র মহাশয় বলেন 'আমাদের দুর্ভাগ্য এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাচীন পুঁথির নিদর্শন হিসাবে আমরা পেয়েছি শুধু চর্য্যাপদের পুথিটি। আজ পর্য্যন্ত পাওয়া বাকি পুথির প্রায় সবই সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ

শতকে অনুলিখিত।' (ড. পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় তুষারকান্তি মহাপাত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) (যাঁরা বাংলা লিপির বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে বা জানতে ইচ্ছুক অথচ কোনো পুঁথিভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন নি তাঁদের পক্ষে আশার কথা এই যে উক্ত পুঁথির মুদ্রিত ফোটোকপি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়)। চর্যাপদ পুঁথিটির লিপিকাল সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'চর্য্যাপদের পুঁথিটি চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে নকল হতে পারে' (পৃ. ১৩)। আর শ্রীকৃষ্টকীর্তন (বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) পুঁথিটির কাল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'পুঁথিটি যে অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর, তার পরবর্তী নয়, তা এর হস্তাক্ষর দেখে লিপিবিশারদেরা সিদ্ধান্ত করেছেন' ('বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ২৬ পৃ.)। তবে মনে হয় ড. সুকুমার সেনের এ বিষয়ে ভিন্নমত ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুঁথির মুদ্রিত ফোটোকপি বিশেষিত সংস্করণে নীলরতন সেন জানাচ্ছেন—'সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) মনে করেন এর ভাষা নিদর্শন ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৫০ এর মধ্যবর্ত্তী সময়কার হলেও প্রাপ্ত পুঁথিটিতে অনেক অর্বাচীন কালের লিপিকরদের হস্তলিপির নিদর্শন মিলছে। পুঁথিতে ব্যবহৃত তুলট কাগজের রাসায়নিক পরীক্ষাতেও তিনি একই সিদ্ধান্তে এসে, এটি অষ্টাদশ শতকে নকল করা হয়েছে বলে গণ্য করেছেন।' (১৩পৃ.) তবে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন যে 'পুঁথিটিতে দু-তিন রকম হাতের লেখার সংমিশ্রণ থাকলেও প্রধান হস্তাক্ষর শ'চারেক বছরের পূর্ববর্ত্তী তা নানা পুঁথির সঙ্গে এর লেখা মিলিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে (২৬ পৃ.)। যাই হোক, মোটের উপর বলা যায় বাংলা পুঁথির বয়সের ঊর্ধসীমা চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি, যার চেয়ে প্রাচীনতর হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই—এবং প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথিটি হচ্ছে চর্যাপদ (বা চর্য্যাচর্য বিনিশ্চয়, চর্য্যাগীতিকোষও বলা হয়)।

বাংলায় মুদ্রণশিল্পের (ছাপাখানার) ইতিহাসও খুব প্রাচীন বলা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলেন—ভারতের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ায় পর্তুগিজদের দ্বারা (অর্থাৎ বলা যায় ধর্মপ্রচারকামী ইউরোপীয় মিশনারিদের কল্যাণেই)। তবে গোয়ায় যে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিকল্পিতভাবে নয়, কিন্তু নিতান্তই দৈবযোগে। অ্যাবিসিনিয়ার সম্রাটের অনুরোধে সেখানে পোর্তুগাল থেকে জলপথে জাহাজে করে একটি মুদ্রণযন্ত্র পাঠানো হচ্ছিল জেসুইট্ পাদ্রিদের দ্বারা। তখন সুয়েজ খাল ছিল না বলে ঘুরপথে যেতে হত—আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের গোয়ায় এসে বিশ্রাম নেওয়া হত। জেসুইট্ পাদ্রিরা মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে যে জাহাজে করে অ্যাবিসিনিয়া যাচ্ছিলেন সেটিও বিশ্রামের জন্য গোয়ায় এসে নোঙর ফেলে। ইতিমধ্যে অ্যাবিসিনিয়ার

সম্রাটের সঙ্গে জেসুইটদের মতান্তর ও বিরোধ ঘটায় উক্ত জাহাজটি আর অ্যাবিসিনিয়া গেল না। ফলে মুদ্রণযন্ত্রটি গোয়াতেই স্থাপিত হল (দ্র. পূর্বোক্ত 'গ্রন্থবিদ্যা' ৪৭ পৃ.)। এইভাবে দৈবযোগে গোয়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ভাষায় লিখিত 'Conclusoes' নামক একটি বই ছাপানো হয়, প্রথম মুদ্রণ কিছু ইস্তেহারও ছাপানো হয় গির্জার দরজায় লাগানোর জন্য (প্রথম মুদ্রিত বইটি পাওয়া যায় না)। অবশ্য ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয় লিপির মুদ্রণ হয়েছিল (মালাবার টাইপ্—মালয়ালাম ও তামিল লিপি) ভারতের কেরলের আম্বালাক্ডাডু নামক স্থানে। বলা বাহুল্য—ইউরোপে অবশ্য মুদ্রণযন্ত্র এর আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক ছাপাইয়ের (মুদ্রণনন্ত্রের) আবিষ্কর্তা হিসাবে জার্মানির গুটেন বার্গ (১৩৯৮-১৪৬৮) এবং হল্যান্ডের কস্টর-এর নাম স্মরণ করা যায়। তবে কাঠে খোদাই-করা লিপির (বা Xylography জাইলোগ্রাফির) সাহায্যে ব্লক বই রূপে ছাপানো পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হিসাবে ধরা হয় বৌদ্ধ গ্রন্থ 'হীরক সূত্র' (চীনা ভাষায় অনুবাদে), যেটি চীনদেশে পাওয়া যায় (আ. ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত)। অর্থাৎ এই ধরনের ছাপানোর কৌশল অনেক আগে থেকেই চৈনিকদের জানা ছিল। (দ্র. 'গ্রন্থবিদ্যা')।

যাই হোক—বাংলায় মুদ্রণশিল্পের প্রচলন আরও অনেক পরের ঘটনা। শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে বাঙালির রচিত বাংলায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ হচ্ছে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত)। সুতরাং বলা যায় বাঙালি রচিত মুদ্রিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই তা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ মোটে দুশো বৎসরের কিছু বেশি কাল যাবৎ উক্তরূপ গ্রন্থ মুদ্রিত হচ্ছে। অবশ্য বাংলা লিপির মুদ্রণ উক্ত বই প্রকাশের আগেও হয়েছে। সাধারণত ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হালহেদ-রচিত বাংলা ব্যাকরণটিকেই (বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং A Grammar of the Bengal Language) বাংলালিপি মুদ্রণে প্রথম বই হিসাবে ধরা হয়। কারণ এটিতে বিচল অক্ষরের (Movable type) ব্যবহার আছে। এর আগেও বাংলালিপি মুদ্রণের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া গেলেও সেগুলি ছাপানো হয়েছে অবিচল অক্ষরে। (এ বিষয়ে দ্র. 'বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' ড. সুবীর মণ্ডল উনি হালহেদের আগেকার কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণ করেছেন)। তবে একথা বলা খুব ভুল হবে না যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলায় লেখাপড়া চর্চার মূল অবলম্বন ছিল হাতে-লেখা বই বা পুঁথি।

লক্ষণীয় এই যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল এক বিদেশির দ্বারা, যাঁর নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ (বা হালেদ)। তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির একজন ইংরেজ কর্মচারী। হুগলিতে অবস্থিত এন্ড্রুজ নামে একজন পুস্তক বিক্রেতার ছাপাখানা থেকে হালহেদের বইটি প্রকাশিত হয় (১৭৭৮)। বইটি অবশ্য ইংরাজিতে লেখা। কিন্তু এর দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতিগুলি বাংলা থেকে নেওয়া (পয়ার ছন্দ প্রভৃতিও আছে) এবং সেগুলি বাংলা অক্ষরে ছাপানো। হালহেদকে সাহায্য করেন তখনকার প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত চার্লস্ উইল্‌কিন্স্। তিনি হাতে বাটালি নিয়ে কাজে নামেন —ছেনি কাটার কৌশল শেখান তার বাঙালি কর্মচারী পঞ্চানন কর্মকারকে। তিনিও অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠেন এই কাজে (বস্তুত বাংলা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম)। পঞ্চানন তাঁর জামাতা মনোহরকেও হরফের কাজ শেখান। এবং এদের সাহায্যে উইলিয়াম কেরি টাইপ ঢালাই-এর কারখানা স্থাপন করেন। এখানে শুধু বাংলাই নয়— দেবনাগর, আরবি, চীনা প্রভৃতি হরফও তৈরি করা হয়েছিল। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল হালহেদ তাঁর বাংলা ব্যাকরণের আখ্যাপত্রে একটা সংস্কৃত বাক্য দিয়েছেন—"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদ ফ্রেজী'। একটা সংস্কৃত শ্লোকও দিয়েছেন। যথা—ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দ বারিধেঃ। প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্।। অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতিরাও যে শব্দসাগরের অন্তে যেতে পারেন নি, তার সামগ্রিক প্রক্রিয়া বলতে মানুষ কীভাবে সমর্থ হবে?' (অর্থাৎ কোনোভাবেই সমর্থ হবে না) বোঝা যায় যে তিনি ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থে ব্যাকরণটা লিখেছিলেন। বিষয়ের গভীরতা বোঝাবার জন্য একটা সংস্কৃত সূক্তিও দিয়েছেন। সেটা অবশ্যই বাংলা অক্ষরে। কিন্তু সংস্কৃত কেন? সেই সময় সংস্কৃত চর্চার স্থানটা কেমন ছিল তা আমরা ক্রমশ বুঝতে পারব।

যেহেতু হালহেদের বাংলা ব্যাকরণটি মূলত ইংরাজি ভাষায় লেখা তাই অনেকের মতে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুদ্রিত পুস্তক হল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এবং জোনাথ্ ডান্‌কান্ কর্তৃক অনূদিত একটি আইন-বিষয়ক বই (অর্থাৎ বইটি বাংলায় অনুবাদ গ্রন্থ) (দ্র-গ্রন্থবিদ্যা-পৃ. ৫০)।

যাই হোক, এইভাবে এক বিদেশির হাতেই সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হল এবং মূলত বিদেশিদের চেষ্টাতেই বাংলায় মুদ্রণের যুগ শুরু হয়ে গেল। এর পর অবশ্য অনেক বাঙালিও যোগ দিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থটিই বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ। এর আগে কেরি সাহেবও বাংলা ব্যাকরণ কিছু আলোচনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে—হালহেদের বাংলা ব্যাকরণ যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন রাজা রামমোহন রায় শৈশব অবস্থায়। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মুদ্রণযন্ত্র চালু হবার

সঙ্গে সঙ্গেই কি পাণ্ডুলিপি বা পুঁথির ব্যবহার উঠে গেল? তা যে হয়নি এখন সে বিষয়ে কিছু সন্ধান করা যাক।

একটা কথা এখানে মনে রাখা দরাকার যে তুলট কাগজ, তালপাতা (পুঁথি করণযোগ্য), শরের কলম এবং ভুষো কালি (বা ভূষা কালি) এ সমস্ত তৈরি করাটা মনে হয় কুটীরশিল্পেরই অন্তর্গত। কাগজ যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা যায়, তেমনই হাতের সাহায্যেও তৈরি করা যায়, যদিও সকলে তা পারে না। কিন্তু তালপাতা সংগ্রহ করে পুঁথিলেখার লেখার যোগ্য করে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ (অর্থাৎ কাগজ তৈরির চেয়ে সহজ)। অর্থাৎ লেখার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণই গ্রামের বাড়িতেও তৈরি করা যেত। এতে লেখাপড়া চর্চার ব্যয়ভারও কমানো যেত। যেহেতু এগুলি একান্তভাবে ব্যাবহারিক জীবনের ব্যাপার তাই কিছুটা ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের শৈশবে আমরা অবশ্য তালপাতায় বর্ণমালা লেখার অভ্যাস করিনি, কারণ ততদিনে বলা বাহুল্য যন্ত্রোৎপাদিত কাগজ বাজারে সুলভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের শৈশবে শরের কলম ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রামের দোকানে কালির বড়ি কিনতে পাওয়া যেত—সেটি একটি কাচের দোয়াতে জলে গুলে রাখা হত। তারপর শরের একটা প্রান্ত ছুঁচলো করে কেটে কালি ধরে রাখার জন্য সেই ছুঁচলো অগ্রভাগটি একটু চিরে রাখা হত। এইভাবে শরের কলম তৈরি হলে তার ছুঁচলো অগ্রভাগটি দোয়াতের কালিতে একবার ডুবিয়ে নিয়ে লিখতে হত। অগ্রভাগটিতে অতিরিক্ত কালি ধরে গেলে একবার একটু ঝেড়ে নিতে হত। পরে অবশ্য শরের এক দিকে ধাতব 'নিব' (Nibe) লাগিয়ে নিয়েও পূর্বোক্তভাবে লেখা যেত। দোকান থেকে দিস্তাদরে কাগজ কিনে নিয়ে ভাঁজ করে মাঝে সেলাই দিয়ে খাতাও তৈরি করা হত। আমাদের পিতামহদের আমলের অনেকে কিন্তু জানিয়েছিলেন যে তাঁরা তালপাতায় লেখা অভ্যাস করেছেন, বাল্যকালে। তালপাতা কিন্তু সরাসরি গাছ থেকে কেটে এনে লেখা হত না। তালপাতা কেটে এনে কিছুদিন পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হত। পরে সেগুলি তুলে নিয়ে এসে পরিষ্কার করে ছায়ায় মেলে দিয়ে জল ঝরিয়ে ও শুকিয়ে নিয়ে উপযুক্ত দ্রব্য দিয়ে ঘসে মসৃণ করে উপযুক্ত মাপ অনুসারে কেটে নিয়ে পুঁথির আকার দেওয়া হত। এই কথাই তাঁরা বলতেন। তালপাতা সহজলভ্য, কিন্তু কাগজ সাধারণত দোকান থেকে পয়সা খরচ করে কিনে আনতে হত। ভুষো কালি (বা ভূষা কালি) তাঁরা বাড়িতে তৈরি করতে পারতেন। (খোলা হাঁড়িতে ভাজা পোড়া চাল খোলার কালি ইত্যাদি কয়েকটি উপাদান দিয়ে)। স্মরণীয় এই যে শিবমহিম্নঃ স্তোত্রেও কজ্জলের কথা বলা হয়েছে। অনেকে এই ভুষোকালির দৃঢ়লগ্নতার প্রশংসা করতেন। বর্তমানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট,

স্মার্ট ফোনের যুগে নূতন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে এসব কথা ইতিহাস হয়ে গেছে। তাই কিছুটা লিখে রাখলাম।

যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতেও পাঠশালায় তালপাতার ব্যবহার ছিল বলেই মনে হয়—অন্তত এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে—"অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল।' এটি উপন্যাসের কথা হলেও এখানে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন আছে বলে মনে হয়। তখনকার দিনে অনেক 'অপু'ই 'পাততাড়ি' (=তালপাতাগুচ্ছ) নিয়ে লেখাপড়া করত তবে সর্বত্র হয়তো সমান অবস্থা ছিল না।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদেশের কৃষক, ১ম পরিচ্ছেদ, পুনর্মুদ্রণে) প্রসঙ্গান্তরে জানিয়েছেন 'আর আমি যে হতভাগ্য, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম।' কথাটা নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথমত বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ফুলিস্কেপ কাগজ পাওয়া যেত। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস—তাঁর একশো বৎসর আগে জন্মালে তুলট কাগজে লেখা পুঁথি পড়াটাই সাধারণভাবে খুব স্বাভাবিক হত। তৃতীয়ত, যেহেতু তুলট কাগজে লেখা পুঁথির কিছু কিছু স্থলে বৃথা 'কচ্‌কচির' অনুকূল উপাদান পাওয়া যায়, সেই কচকচিতে তাঁকে যোগদান করতে হত। প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন নব্যযুগের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কাজেই কালগতির প্রভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক মতিগতিরও যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে—সেই দিকেই মনে হয় তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

তবে বিশেষ কিছু নিদর্শন থেকে মনে হয়—সাহিত্যসম্রাটের সমসময়েও দেশকালপাত্রভেদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালপত্রের ব্যবহার ছিল এবং তুলট কাগজেও লেখা হত। বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কয়েক বছরের কনিষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) তাঁর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমি নন্দী মহাশয়ের বাঙ্গালা অক্ষর লেখা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আরবির বর্ণমালা মুখস্থ হইল। তালপাত্রে অক্ষরও লিখিতে লাগিলাম।' (দ্র. মীর মশাররফ হোসেন জীবনালেখ্য—রচয়িতা-আবুল আহসান চৌধুরী ২৯ পৃ.) বাংলায় নারীর লেখা প্রথম আত্মজীবনীরূপে প্রসিদ্ধ রাসসুন্দরী দেবীর (১৮০৯-১৮৯৯) 'আমার জীবন' গ্রন্থেও

পুঁথি ব্যবহারের কথা আছে। ঐ গ্রন্থে ষষ্ঠ রচনায় তিনি বলেছেন—'আমি কিছু লেখাপড়া জানি না, সুতরাং পুঁথি চিনিতে পারিব না...' 'এখানকার পুস্তক সকল যে প্রকার সেকালে এ প্রকার ছিল না। সে সকল পুস্তকে কাঠের আড়িয়া লাগান থাকিত। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র ছবি আঁকাইয়া রাখিত।' 'পরে পুস্তকখানি ঘরের মধ্যে রাখিলে আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া একটি পাত লুকাইয়া রাখিলাম। সে পাতটি কোথা রাখিব, কেহ দেখিবে বলিয়া ভয় হইল।' 'আর কোথা রাখি, রান্না ঘরের হেঁসেলের মধ্যে খোড়ীর নীচে লুকাইয়া রাখিলাম।' (এখানে তিনি পুঁথি ও পুস্তক একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। মনে হয়—পুঁথির পাতাগুলি দুটি পাটা দিয়ে বাঁধা থাকত বলে সহজেই খুলে দু একটি পাত নেওয়া যেত। এখানে ব্যবহৃত 'আড়িয়া' শব্দটি উক্ত অর্থে যথোক্ত বানানে হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে নেই।)

মুদ্রণযন্ত্র প্রচলিত হওয়ার পরেও যে পুঁথি রচিত হয়েছে তার কিছু নিদর্শন আমরা বিভিন্ন পুঁথি-শালায় পুঁথি-বিবরণ-পুস্তক বা Descriptive Catalogue অনুধাবন করলেও বুঝতে পারি। এখানে নীচে বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগ থেকে প্রকাশিত 'Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript'-এর পঞ্চম খণ্ড (কোষ ও সাহিত্য) থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল (১) উদ্ধবদূতম্—লিপিকাল ১৮২০ খৃ. (পৃ. ১০০) (২) পদাঙ্ক দূতম্ ১৮৬৭ খৃ. (পৃ. ৯৭) (৩) অমরকোষ ১৮২৮ খৃ. (পৃ. ৪৬) (৪) একাক্ষর কোষ ১৮৪৮ খৃ. (পৃ. ২৮) (৫) অমরকোষ ১৮৭০ খৃ. (পৃ. ১৩) দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। এই পুঁথিগুলি সবই কাগজে লেখা এবং শেষেরটি ছাড়া সবগুলিই বাংলা অক্ষরে। শেষেরটি দেবনাগরী অক্ষরে। অমরকোষের একটি পুঁথি তালপাতায়ও আছে। সেটি (১১পৃ.) বঙ্গাক্ষরে এবং খুব পুরোনো—লিপিকাল ১৪৭০ খৃ.। দেখা যাচ্ছে তুলট কাগজে লেখা পুঁথির সংখ্যাই বেশি। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুঁথিগুলির মধ্যেও দেখা যায় চর্যাপদের পুঁথি তালপাতায়, কিন্তু বাকি অধিকাংশই তুলট কাগজে লেখা। মনে হয় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে তুলট কাগজেই স্থায়ী পুঁথি লেখা হত। বর্ণমালা লেখা অভ্যাস করা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে সহজলভ্য তালপাতাতে করা হত। তালপাতাতে কিছু পুঁথিলেখার আর একটা কারণ ছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিতে তালপাতা পবিত্র। কাজেই বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও তন্ত্রমন্ত্রের পুঁথি-শ্রাদ্ধপদ্ধতি পৌরোহিত্য কর্মোপযোগী বিরাট পর্ব প্রভৃতি পুঁথি পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তালপাতাতেই লিখতেন। তালপাতায় বীজমন্ত্র লিখে কবচের মধ্যে দেওয়া হত পবিত্রতার কারণেই। সবচেয়ে বড়ো কথা হল তখন হাতের লেখা সুন্দর করে অভ্যাস করার উপর অভিভাবকেরা জোর দিতেন (তখন জেরক্স মেশিন ও কম্পিউটার প্রচলিত ছিল না)। তখন অনেকে মুদ্রিত বই-এর উপর নির্ভর না করে

নিজের প্রয়োজনীয় ও ভালোলাগার পাঠ নিজেই ব্যক্তিগত খাতায় লিপিবদ্ধ করে নিতেন। যেমন ওঝা, কবিরাজ, গোচিকিৎসক প্রভৃতিদের কাছে পাওয়া যেত মন্ত্রতন্ত্র ঔষধপত্রাদির লিপিপুস্তক, তেমনই অনেক মূল গায়েন, কবিয়াল, কথক ও লোকগায়ক প্রভৃতিদেরও ব্যক্তিগত খাতা থাকত—নিজের নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় পুরাণ কথা প্রভৃতি লিখে রাখতেন। অনেকসময় টোলের ছাত্রেরা ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণ পুঁথির মতো করে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন (এরূপ একটি পাণ্ডুলিপি আমি পেয়েছিলাম)। এগুলি সমস্তই হস্তলিপির উদাহরণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গত জীবনস্মৃতিতে জানিয়েছেন —'...তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।' ('জীবনস্মৃতি' ৫০ পৃ.)।

এইখানে আর-একটি কথা বিবেচনা করা দরকার। আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে পুরোনো পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে হলে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—শুধু লিপিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়—পুঁথির বিষয় ও লিপিকালের সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটিও বোঝা প্রয়োজন। যেমন—প্রাচীন বাংলা পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে হলে সংস্কৃত প্রভৃতির জ্ঞানও প্রয়োজনীয় হয়—অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কারণ সংস্কৃত ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যাচর্চার বাহন ও সংস্কৃতির ধারক—ভারতের প্রতিটি প্রদেশেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও সংস্কৃত অনেক স্থলে প্রত্যাশিত ভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—চর্যাপদ (চর্য্যাচর্য বিনিশ্চয় বা চর্য্যাগীতি কোষ) প্রাচীন বাংলায় লেখা, কিন্তু এর টীকাটি মুনিদত্ত লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়। তা ভালোভাবে বোঝার জন্য সংস্কৃত-বৌদ্ধ-তন্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানও প্রয়োজনীয় হওয়া অসম্ভব নয় (তিব্বতিতেও সিদ্ধাচার্যদের কথা আছে, তিব্বতিতে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও আছে)। মুনিদত্ত সংস্কৃতে লিখলেন কেন? মনে হয়—কারণ সংস্কৃতে টীকা রচনার একটি ঐতিহ্য আছে পরম্পরাপ্রাপ্ত। আর-একটি কারণ মনে হয় বাংলা গদ্যের যুক্তিগর্ভ ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বলিষ্ঠতালাভের বহুশত বর্ষ আগেই সংস্কৃত গদ্যের যুক্তিসম্মত অপরূপ সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল (পতঞ্জলি, শঙ্করাচার্য প্রভৃতিদের গদ্য উদাহরণ দেওয়া যায়)। অবশ্য চর্যাপদের কালেও লোকেরা গদ্যেই কথাবার্তা বলতেন। অনুরূপভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের) মধ্যেও আমরা অনেক সংস্কৃত শ্লোক পাই। যেগুলি বিভিন্ন গানের সঙ্গতিসূচকরূপে ধারাবাহিক ঘটনার বিবৃতিমূলক—যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে দেখা যায়। মঙ্গলকাব্য থেকেও সংস্কৃত শিক্ষাপ্রচলনের একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর আত্মকথায়

বলেছেন—তাঁর পড়াশোনার প্রতি অবহেলা দেখে তাঁর দাদা তাঁকে গুরুগৃহে পাঠালে, তিনি গিয়ে তার পরদিনই ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশে ফিরে আসেন। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাঁর দাদা এত ক্রুদ্ধ হন যে পুঁথিপত্রগুলি ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন। রূপরাম বলছেন—'দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে। কালি গেল পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে।। কাছারিল অমর জুমর অভিধান। বাহিরে সুবন্ত টীকা গড়াগড়ি যান।' এখানে দেখা যাচ্ছে রূপরামের দাদা যে পুঁথিগুলিকে কাছাড় দিয়েছিলেন—সেগুলির মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের পুঁথিগুলিই উল্লেখযোগ্যতা লাভ করেছে। অর্থাৎ ঐগুলি তখন চর্চা করা হত। প্রাথমিক পর্যায়ে ও সংস্কৃত শিক্ষার অনুবৃত্তি এমনকি ব্রিটিশ আমলেও প্রকাশিত 'শিশুবোধক' নামে বইটির মধ্যে পাওয়া যায়—যেটি আমাদের পিতামহদের কালে অনেকেই পড়তেন।

মুসলিম-আমলে অনেক আরবি-ফারসি শব্দও বাংলায় গৃহীত হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধেও অবহিত থাকা প্রয়োজন (যেমন—জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কেবা কৈল নিরমান। এখানে কামান শব্দ ফারসি)। বস্তুত কাগজ, কলম ও দোয়াত তিনটি শব্দই আরবি। বাঙালিরচিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ—'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থেও আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষিত হয়। এইসব নানা কারণে পুঁথি গবেষণা দুরূহ হয়ে উঠেছে। অনেক পুঁথি হয়তো শুধু বিদেশের সংগ্রহশালায় পাওয়া (প্রসঙ্গত স্মরণার্থে বলি শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল মহাশয় একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন প্রাচীনতম তালপাতার পুঁথিটি (৬০০ খৃ.) আছে টোকিও মিউজিয়ামে এবং ঔষধ সংক্রান্ত বাওয়ার পাণ্ডুলিপিটি বার্চবার্কে লেখা (৫০০ খৃ.) এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে দ্র. 'Aspects of Manuscriptalogy' p. 136)।

সংস্কৃতশাস্ত্রের ক্ষেত্রটিও তদনুরূপ দুরূহ। যেমন—প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র ও বেদান্তাদিশাস্ত্রের বিষয়ে পুঁথির পাঠ গ্রহণের জন্য শুধু লিপিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। 'সেই তত্ত্বের বা দর্শনের নানা দিক ও তার ধর্মীয় পটভূমি এবং তাদের বিশেষ বিশেষ পরিভাষা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে পাঠগ্রহণ বিভ্রান্তিকর হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থেও সেইরূপ বিভ্রান্তিকর পাঠ পাওয়া অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত তাৎপর্য পরিজ্ঞানের জন্য পাণ্ডুলিপিটির পুনঃপাঠ বা পুনর্বিবেচনা অবশ্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। বস্তুত বর্তমান প্রবন্ধকারকে এবিষয়ে প্রথম সচেতন করেন স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুর মহোদয়। তিনি কিছু সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে বিভ্রান্তিকর পাঠ (যেমন ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা, সাংখ্যকারিকার টীকা, যুক্তিদীপিকা ইত্যাদি থেকে) দেখান। সেগুলিতে তত্ত্বগত ভুল ছিল। হয়তো

সেগুলি লিপিকরপ্রমাদ। এবং সম্পাদকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। পণ্ডিত রাজেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড় সম্পাদিত, চৌখম্ভা প্রকাশিত, ১৯৯০ খৃ.-তে পুনর্মুদ্রিত, ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকার ১৩৫ পৃষ্ঠায় আছে যথাহু র্নিরুক্তকারাঃ নির্বিকল্পকবোধেন দ্ব্যাত্মকস্যাপি বস্তুনঃ ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা জানেন এটি নিরুক্তকারের কথা নয়। বস্তুত এটি শ্লোক বার্ত্তিককার কুমারিলের। কিছু একটা প্রমাদ ঘটেছে। এরূপ আরও উদাহরণ আছে যেগুলির পুনর্বিবেচনার জন্য পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠ গ্রহণ প্রয়োজন।

স্বগর্ত মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য মহোদয় বিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির একটি টীকা ছাপাতে শুরু করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য ও শিক্ষণীয়। তাঁর নিজের দৃষ্টিতে যেটি শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত সেটি দেওয়ার পাশাপাশি তিনি বিবেচনার জন্য ফুটনোটে লিপিকার ধৃত পাঠটিও সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। পাঠসম্পাদনার এই পদ্ধতিটির প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্তের একটি কথা মনে পড়ে 'উপাদেয়স্য সংপাঠস্তদ্বন্যস্য প্রতীকনম্'। (অভিনব ভারতীয় প্রারম্ভিক শ্লোকগুলি দ্র.) অভিপ্রায় এই যে—যেরূপ পাঠটি শুদ্ধ মনে হচ্ছে সেটি সন্নিবিষ্ট করার পাশাপাশি তদ্ভিন্ন পাঠটিও বিবেচনার জন্য দিতে হবে। এরকম ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি একই সূত্র দুটি স্থলে দুরকম আকারে সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে একই গ্রন্থে। সে ক্ষেত্রেও প্রকৃত তথ্য জানতে পুনরন্বেষণ প্রয়োজন।

বস্তুত পাঠসমস্যা ও পাঠ পর্যবেক্ষণে মতভেদ কেবল আধুনিক গবেষকদের ব্যাপার নয়। আমাদের প্রাচীন টীকাকারেরাও অনেকক্ষেত্রে লিপিকর প্রমাদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কেউ কেউ বিশেষ একটি পাঠকে প্রামাণিক বলেছেন। অনেকে আবার দুটি পাঠকেই (সম্ভবস্থলে) একসঙ্গে দিয়ে কোন পাঠে কী অর্থ করা যায় তাও বিবৃত করেছেন। সব চেয়ে ঐতিহাসিক ক্ষতি হয় যদি লিপিকরই নিজের পাণ্ডিত্যবলে মূলপাঠের কিছু স্বরুচিসম্মত পরিবর্তন করে দেন (যা বস্তুত মূলকারের অভিপ্রেত নয়), অথবা কিছু স্বরচিত ব্যাখ্যা মূলের সঙ্গে সংযোজিত করে দেন এবং সেটিও কালস্রোতে মূলকারেরই রচিত বলে চলে যায়। এমনকি এই আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক যুগেও অনেক নীতিবাদী সম্পাদক প্রাচীন শাস্ত্রের মুদ্রণে অনেক ক্ষেত্রে মূলপাঠের মধ্যে যেগুলি তাঁর আধুনিক মননের দৃষ্টিতে রুচিগর্হিত বলে মনে হয় সেগুলি বাদ দিয়ে বা তাঁর দৃষ্টিতে সুরুচি সম্মত ভাবে পরিবর্তিত করে ছাপানোর পক্ষপাতী। এঁরা স্মরণে রাখেন না যে একটি প্রাচীনগ্রন্থ হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। সেই দেশ কাল পাত্র ও ভাষা সমেত একটি অখণ্ড সংস্কৃতির দলিল। তাকে বিকৃত করলে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হয়।

এরকম ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপির পুনর্বিবেচনা অপেক্ষিত। বস্তুত শিলালিপির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিকৃতি বা প্রক্ষেপ খুব সহজসাধ্য নয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের লিপিকরদের ধৃত পাঠের বিভিন্নতার জন্য বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোক সংখ্যাও সব অঞ্চলে এক প্রকার নয়। অন্তত তিন প্রকার ধৃত পাঠ পাওয়া যায় অঞ্চলভেদে। (১) বঙ্গীয় পাঠ, (২) দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ ও (৩) পশ্চিমোত্তরীয় পাঠ। ফলে—অভিজ্ঞতায় দেখেছি গবেষণাপ্রবন্ধে রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা দেওয়া থাকলে প্রশ্ন ওঠে কোন অঞ্চলের পাঠ অনুযায়ী এই সংখ্যা। কোনটা প্রকৃত বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত ইত্যাদি। অন্যান্য নানা প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধেও একই সমস্যা দেখা গেছে। সম্প্রতি প্রয়াত ড. করুণাসিন্ধু দাস তাঁর একটি প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন—জয়দেবের গীতিগোবিন্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে তিনি 'ধেহি পদপল্লবমুদারম্'-এই প্রকার পাঠ পেয়েছেন। (দ্র. জয়দেব কেন্দুলী থেকে প্রকাশিত 'স্বপ্ননীড়' পত্রিকা, জয়দেব মেলা সংখ্যা, ২০১৩)। নানা পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় তাই অনেক তথ্য পুনর্বিবেচিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বেশ কিছু সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতি অনুবাদে পাওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটি অস্পষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিভ্রান্তিকর, সেক্ষেত্রে তিব্বতি অনুবাদের সাহায্য নিয়ে অনেক সময় প্রকৃতপাঠ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এবং এইভাবে সে ক্ষেত্রে অনুবাদের আলোকে পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠ করা যায়।

পুরাণগুলির মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে ধৃতপাঠে ব্যাকরণগত বিচ্যুতি প্রভৃতি মূলপাঠ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা দেবীপুরাণের একটি অধ্যায় পর্যালোচনা করতে পারি। দেবীপুরাণের এক নবতিতম অধ্যায়ে বিদ্যাদানের মহিমা বিবৃত করা হয়েছে (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশিত দেবীপুরাণের ৫০০ পৃষ্ঠাঙ্ক থেকে দেখুন)। এর মধ্যে কীভাবে নানা পাঠান্তর এসেছে ও ব্যাকরণগত বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলি পুনর্বিবেচনার অপেক্ষায় নানা প্রশ্ন জাগায়।

দেবীপুরাণের এই অধ্যায়ে বিদ্যাদানের মহিমা উচ্চপ্রশংসিত। এই বিদ্যাদান পুস্তকদানের মাধ্যমেও হতে পারে। বলা হয়েছে 'যস্ত দেব্যা গৃহে নিত্যং বিদ্যাদানং প্রবর্ত্তয়েৎ। স ভবেৎ সর্বলোকানাং পূজ্যঃ পূজাপদং ব্রজেৎ।।' ভাবার্থ এই যে দেবীর গৃহে যিনি নিত্য বিদ্যাদান প্রবর্তিত করেন—তিনি সর্বলোকের কাছে সম্মাননীয় হন, এবং পূজনীয় পদ লাভ করেন। এরপর যেসব বিধি অনুসারে 'বিদ্যা' লেখা হবে ও দান করা হবে যাতে মাতৃগণ সন্তুষ্ট হবেন—সেগুলি বলা হয়েছে (বিদ্যাদানং প্রবক্ষ্যামি যেন তুষ্যন্তি মাতরঃ। লিখ্যতে দীয়তে যেন বিধিনা তং শৃনুষ্বনঃ।।)। (এই প্রসঙ্গে একটি

কথা স্মরণ করা যায়। ধর্মকর্মবিষয়ক পুঁথির ক্ষেত্রে ধর্মীয় পুঁথিকে মহত্ত্বসূচক পূজনীয়রূপে দেখাটা প্রত্যাশিত ছিল। ধর্মকর্মাদি বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থে ও তার অনুকরণে সেই ভাব নিয়ে আসার ঐতিহ্যপ্রবণতায় অনেক সময় দেখা গেছে—হিন্দুদের নানা পূজাপদ্ধতির বই পুঁথির মতো লম্বাটে করে মুদ্রিত, ভাবগত পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টায় কিছু তন্ত্রমন্ত্রের বই লালকালিতে ছাপা, আর মুসলিমদের কিছু কিস্‌সাজাতীয় বই বাংলায় লেখা হলেও আরবিগ্রন্থের মতো উলটৌদিক থেকে খুলে পড়তে হয়)।

যাই হোক, কী ধরনের পুস্তক দান করা হবে সে সম্বন্ধে দেবীপুরাণের উক্ত অধ্যায়ে একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা—সিদ্ধান্তমোক্ষশাস্ত্রাণি বেদান্ স্বর্গাদি সাধকান্। তদঙ্গনীতিহাসানি দেয়া ধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে।। অর্থাৎ সিদ্ধান্তমোক্ষ শাস্ত্র (আস্তিকদর্শনের বই) এবং স্বর্গাদিসাধক বেদ ও বেদাঙ্গ, ইতিহাসসমূহ দান করা কর্তব্য ধর্ম বৃদ্ধির জন্য (দেবী পু. ৯১/১৩)। এখানে ইতিহাসানি দেয়া ইত্যাকার প্রয়োগ প্রশ্ন জাগায় ইতিহাস শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হলে 'দেয়া' শব্দে পুংলিঙ্গ কেন? এছাড়া 'দেয়া' এই স্থলে কর্মবাচ্যে প্রত্যয় প্রযুক্ত হলে 'বেদান্ স্বর্গাদি সাধকান্' এই স্থলে অভিহিত হওয়ায় প্রথমাবিভক্তিই বা হয়নি কেন? অনুরূপ বিভ্রান্তিকর প্রয়োগ পরেও রয়েছে। যথা গারুড়ং বালতন্ত্রঞ্চ ভূততন্ত্রানি ভৈরবম্। শাস্ত্রানি পঠনাদ্দানান্ মাতরঃ ফলদা নৃণাম্।। এখানে শাস্ত্রানাৎ পঠনাৎ হলেই সহজবোধ্য হত। এরপরে আছে 'জ্যোতিষং বৈদ্যশাস্ত্রানি কলা কাব্যং শুভাগমান্। দানাদারোগ্যমাপ্নোতি গান্ধর্বং লভতে পদম্।।' এখানেও 'শুভাগমান্' শব্দে কর্মবিভক্তিও সুবোধ্য নয়। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে।

দেবীপুরাণের এই অধ্যায়ে আর একটি তথ্য হল—'নন্দিনাগরকৈ বর্ণৈঃ লেখয়েচ্ছিবপুস্তকম্।' অর্থাৎ মাঙ্গলিক পুস্তক নন্দিনাগরক লিপিতে লিখতে হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এই লিপিজ্ঞান প্রয়োজনীয়। এখানে যেভাবে বিদ্যার প্রশংসা করা হয়েছে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বলা হচ্ছে 'অন্ত্যজা অপি যাং প্রাপ্য ক্রীড়ন্তে গ্রহরাক্ষসৈঃ। সা বিদ্যা কেন মীয়েত যস্যাঃ সর্পা ন সর্পিনঃ।।' অর্থাৎ অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও যা লাভ করে গ্রহ ও রাক্ষসদের সঙ্গে খেলা করতে পারে সেই বিদ্যার কি উপমা বা তুলনা আছে? যার প্রভাবে সর্পও যেতে পারে না। বিষ অত্যন্ত প্রাণঘাতী পদার্থ। সামান্য ভক্ষণ করলেই মৃত্যু হয়। 'এবং বিধং বিষং বৎস বিদ্যামন্ত্রপ্রভাবতঃ। জীর্য্যেত ভক্ষিতং পুংভি স্তস্মাদ্ বিদ্যা পরা মতা।' অর্থাৎ 'হে বৎস! সেই বিষম বিষকে ও মানুষে ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ বিদ্যা ও মন্ত্রের প্রভাবে জীর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং সর্বাপেক্ষা বিদ্যাই প্রধান।' আর সেই বিদ্যা গ্রন্থে আশ্রিত থাকে। '(পাঠান্তরে) 'বিদ্যাগ্রন্থাশ্রিতা নৃপ।' (৯১/২৩)। সুতরাং গ্রন্থও আদরণীয়। বস্তুত শুধু মন্ত্রবিদ্যা নয়, অন্যান্য নানা বিদ্যাও গ্রন্থ থেকে লাভ করা

যায়। অবশ্য এ বিষয়ে দেবীপুরাণকারের দ্বিমত নেই। বিদ্যাদানের প্রশংসায় ও গ্রন্থের মহিমাখ্যাপনে অনেক সদুক্তিই এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাকরণগত বিচ্যুতিগুলি মনকে সপ্রশ্ন করে তোলে। কোনটি মুদ্রাকরপ্রমাদ, কোনটি বা লিপিকরপ্রমাদ ইত্যাদি বোঝার জন্য তাই বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে আরও অনেক আলোচ্য আছে, তবে আপাতত এখানেই এ প্রবন্ধ শেষ করা যাক্।

যেসব বই পড়ে উপকৃত হয়েছি সেগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া হল।

গ্রন্থপঞ্জী

১. যখন ছাপা বই ছিল না, ড. অণিমা মুখোপাধ্যায়। বুকফ্রস্ট, ১৯৯৮।
২. পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি, ড. অণিমা মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ২০০১।
৩. বাংলা পুঁথির গঠন ও প্রকৃতি, ড. কল্যাণকিশোর চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯।
৪. পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম। গতিধারা, ২০০০।
৫. বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ড. সুবীর মণ্ডল দে'জ পাবলিশিং ২০১০।
৬. চর্য্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়া প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৯৫।
৭. দেবীপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)।
৮. চর্য্যাগীতি পরিক্রমা, ড. নির্মল দাশ, দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৭।
৯. বাংলা পুথির নানা কথা, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, ১৯৯৬।
১০. পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা ড. কল্পনা ভৌমিক, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২।
১১. বাংলা পুথির পুষ্পিকা, যূথিকা বসু ভৌমিক, সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯।
১২. The Origin of Brahmi script, Editor–S.P. Gupta, K.S. Ramachandram, D.K. Publications, 1979।
১৩. The Indic Scripts, Editors-P.G. Patel, Pramod Pandey, Dilip Rajgor. D.K. Printworld (P) Ltd, 2007.
১৪. Aspects of Manuscriptology, Ed. Ratna Basu. Karunasindhu Das, The Asiatic Society, Kolkata–Reprint 2009।
১৫. ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা, সম্পাদক-রাজেশ্বর শাস্ত্রী দ্রবিড়। চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান-বারাণসী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০, ইত্যাদি।